এল. বি. ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশনালের চতুর্থ ছবি

বাড়ী থেকে পালিয়ে

চিত্ররূপঃ ঋত্বিক ঘটক

এল, বি, ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশনালের চতুর্থ ছবি • শিবরাম চক্রবর্তীর মূল কাহিনী অবলম্বনে

শ্রীমান পরমভট্টারক অভিনীত

বাড়ী থেকে পালিয়ে

চিত্ররূপ : ঋত্বিক ঘটক
চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত
শব্দ-পুনর্লিখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধায়ক : সন্তোষকুমার দাস
ব্যবস্থাপনা : শৈলেন ঘোষ, দারু গাঙ্গুলী
প্রচার শিল্পী : খালেদ চৌধুরী

গীতরচনা ও সঙ্গীত : সলিল চৌধুরী
শব্দগ্রহণ : মৃণাল গুহঠাকুরতা
সম্পাদনা : রমেশ যোশী
রূপসজ্জা : শক্তি সেন
দৃশ্যসজ্জাতত্ত্বাবধায়ক : ধীরেশ দাস (কালে)

প্রযোজনা : প্রমোদ লাহিড়ী
দৃশ্যসজ্জা : গোপাল ভৌমিক, মণিসর্দ্ধার
কালু মহারা, কালিন্দী।
কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
শ্যামলমিত্র, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
নেপথ্যে-কণ্ঠে : গীতা দে।

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : গোবিন্দলাল চট্টোপাধ্যায়
পুনু সেন, অজিত লাহিড়ী, কামাল উদ্দিন,
শান্তি সেন।
সঙ্গীত : অনিল চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনায় : গোবিন্দলাল চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রগহনে : সুনীল চক্রবর্ত্তি, শঙ্কর চট্টোঃ,
দুর্গা রাহা, নুরু।
শব্দগ্রহনে : অনিল নন্দন, মহাদেব, কালী
রূপসজ্জায় : পাঁচু, বরেন, কত্তিক, ঠকা
রসায়নাগারিক : কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্যবস্থাপনায় : গোকুল, নিমাই, ত্রৈলক্য।
আলোক সম্পাতে : কেনারাম হালদার
কেষ্টদাস, ব্রজেন দাস, কালীচরণ, মঙ্গল
সিং, রাম খেলাওন, বেনু, জগন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ, আলীপুর চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ, সম্মিলিত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি, কলিকাতা ট্রাম মজদুর ইউনিয়ন, যাযাবর সঙ্ঘ, শিশুতীর্থ, পিকো রেঁস্তোরা, লেক বাজার কর্তৃপক্ষ, পি, এস, দাস এণ্ড কোং, শ্রীবারীন সাহা, শ্রীশ্যাম চক্রবর্ত্তী, এস, সর্বাধিকারী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মানিক গুপ্ত, অসিতাভ গুহ, ম্যাডস্ স্কোয়ারের ছেলেরা এবং কলিকাতা সহরের জনসাধারণ।

॥ এই ছবি তাদেরই উপহার দেওয়া হোল, যারা নিজেদের শৈশবকে লুকিয়ে লুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলেছে সারা জীবন ॥

কাঞ্চন বড় দুরন্ত।

ঐটুকু বয়েস হলে হবে কী, যতরকমের দুষ্টুমী বুদ্ধি মাথায় সবসময় গিজ্ গিজ্ করছে। বাবা হচ্ছেন গাঁয়ের ডাক্সাইটে হেড্মাষ্টার মশাই, তিনিও মেরে মেরে হদ্দ হয়ে গেলেন,—কাঞ্চন আর শায়েস্তা হল না। উল্টে তাকে বাঁচাতে গিয়ে মা গালি খেয়ে মরলেন—আর কাঁদলেন। কাঞ্চনের চোখে তার বাবা একটা বিরাট দৈত্য যেন, তার বন্দিনী রাজকন্যা মাকে খালি দুঃখু দিয়ে আর কাঁদিয়ে তাঁর অনান্দ।

কাঞ্চন যতরাজ্যের সব য়্যাড্ভেঞ্চারের বই পড়ে—আর স্বপ্ন দেখে অনেক দূরে চলে গিয়ে অনেক বড় হয়ে অনেক থলি মোহর ঝম্ঝমিয়ে ফিরে এসে তার মার দুঃখু ঘোচাবে।

—এম্নি অবস্থা যখন, তখন একদিন ইস্কুল পালিয়ে গৃহদেবতার ভোগ চুরি করে খেয়ে পুরুত মশায়ের ছেলের মাথায় ভাঁড় ভেঙ্গে যখন সে জানতে পারল, যে বাবা সব জেনেছেন এবং চাবুক বের করেছেন—তখন ওর মনে হঠাৎ কেমন যেন একটা বৈরাগ্যভাব চাগাড় দিল। মনে মনে ভাবল,—সেই দারুণ শহর কলকাতা, যার কথা সে খালি শুনে আসছে অথচ কখনও দেখেনি—সেইখানে চলে যাবে বাড়ী থেকে পালিয়ে—অনেক রোজগার করে ফিরে আসার জন্যে। এই মতলব আঁটতে না আঁটতেই স্বশরীরে স্বয়ং বাবার আবির্ভাব, কাজেই স্থানত্যাগেন গুরুজনাৎ করে কাঞ্চন পোঁ-পোঁ দৌড় দিয়ে বাড়ী থেকে পালাল।

কলকাতা। ঠিক যেন এক রূপকথার শহর। অথবা সেই য়্যাড্ভেঞ্চারের স্বর্ণনগরী এল্ডোরাডো। মার দুঃখু ঘোচাতে এই শহরে এসে কাঞ্চনের চোখে কে যেন মায়াকাজল বুলিয়ে দিল। সেই কাজলের ভোলানিতেই ও প্রায় মরতে বসেছিল। হাঁদার মত হাঁ করে যখন সে অভ্রংলেহী অট্টালিকা দেখছে, পেছন থেকে সার্পিল গতিতে এক মোটর এসে প্রায় সাবাড় হবার যোগাড়

বাঁচাল হরিদাস। কাঞ্চনের শহরে প্রথম বন্ধু হরিদাস যেন সত্যিই রূপকথার পাতা থেকে প্রাণ পেয়ে উঠে এসেছে। হরিদাস ফিরিওয়ালা। তার সঙ্গেই কাঞ্চনের প্রথম এখানের জীবন দেখা শুরু।

কিন্তু কাঞ্চন তো সত্যিকারের পলাতক বালক। একজায়গায় ওর মন বসবে কেন? হরিদাসের কাছ থেকেও পালিয়ে সে এই ভারী মজার শহরটার নানান্ ঘটনাস্রোতে মিলিয়ে গেল।

দারুন খিদে পেয়ে শেষে সন্ধ্যাবেলায় এক বড়লোকের বাড়ীর বিয়েতে রবাহুত হয়ে ঢুকে সেঁটে খাবার প্ল্যান্ করতে গিয়েই তার মিনির সঙ্গে প্রথম ঝগড়া এবং তারপর আলাপ। মিনিকে তার দারুন ভাল লেগে গেল। সে স্বপ্নও দেখে ফেলল—মিনিকে নিয়ে সে মার কাছে ফিরে গেছে।

কিন্তু সকলের সঙ্গে সঙ্গে মিনিও কোথায় চলে গেল, আর কাঞ্চনকেও পথে বেরিয়ে পড়তে হল। আলাপ হল তার ভজার সঙ্গে। ভজাকে ছেলে ধরার দল নিয়ে গিয়ে পুষছে। তার সঙ্গে কাঞ্চন য়্যাড্ভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ল। গুণ্ডারদলের হাত থেকে ভজাকে ছিনিয়ে নিতে গিয়ে কাঞ্চন সত্যিকারের বিপদে পড়েছিল প্রায়। সে বেঁচে গেল, কিন্তু ভজাকে জন্মের মত হারাল। তারপর কাঞ্চন পর পর কত মানুষই না দেখল এই শহরের বুকে।—কত দুঃখী মা, কত দুঃখী ছেলে—কত কান্না আর হাসি। সবই রূপকথা যেন, ঠিক সত্যি সত্যি নয়।

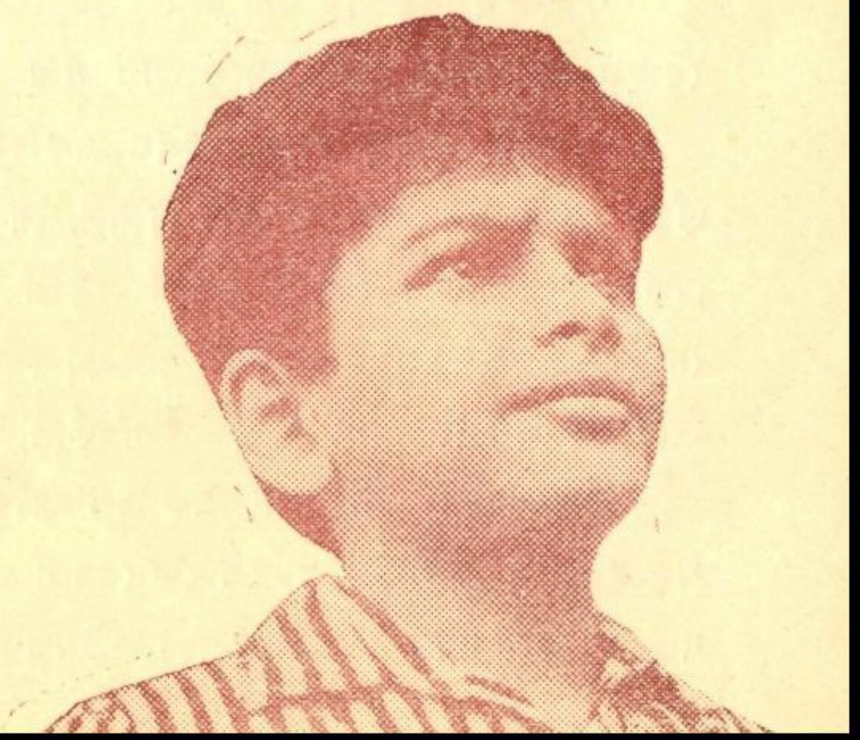

তারই মধ্যে দিয়ে সে স্বপ্ন দেখে চলে,—যা কিছু ভাল, যা কিছু সুন্দর—সব তার মার কাছে যেন সে গিয়ে উপহার দিচ্ছে। এমনি স্বপ্ন দেখতে দেখতেই

একদিন তার হঠাৎ আবার মিনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তাদেরই বাড়ীর নীচেতে।

মিনির মাকে দেখল সে। তার নিজের মার কথা মনে পড়ে গেল। এই অসুখে ভোগা রুগ্ন মিনির মাটিকে সে ডেকে বসল—মাসী !—এত, আদর, এত স্নেহ যেন সে আর পায়নি কোথাও এই শহরে।

মাসী ধরে ফেললেন, সে বাড়ী থেকে পালিয়েছে। আরও জানলেন খবরের কাগজের 'নিরুদ্দেশ' বিভাগে কাঞ্চনের বাবা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কাঞ্চনের মা নিদারুন রোগে শয্যাগতা।

মিলির বাবা ও মা ঠিক করলেন পরদিন সকালেই ওকে দেশে পাঠিয়ে দেবেন ॥

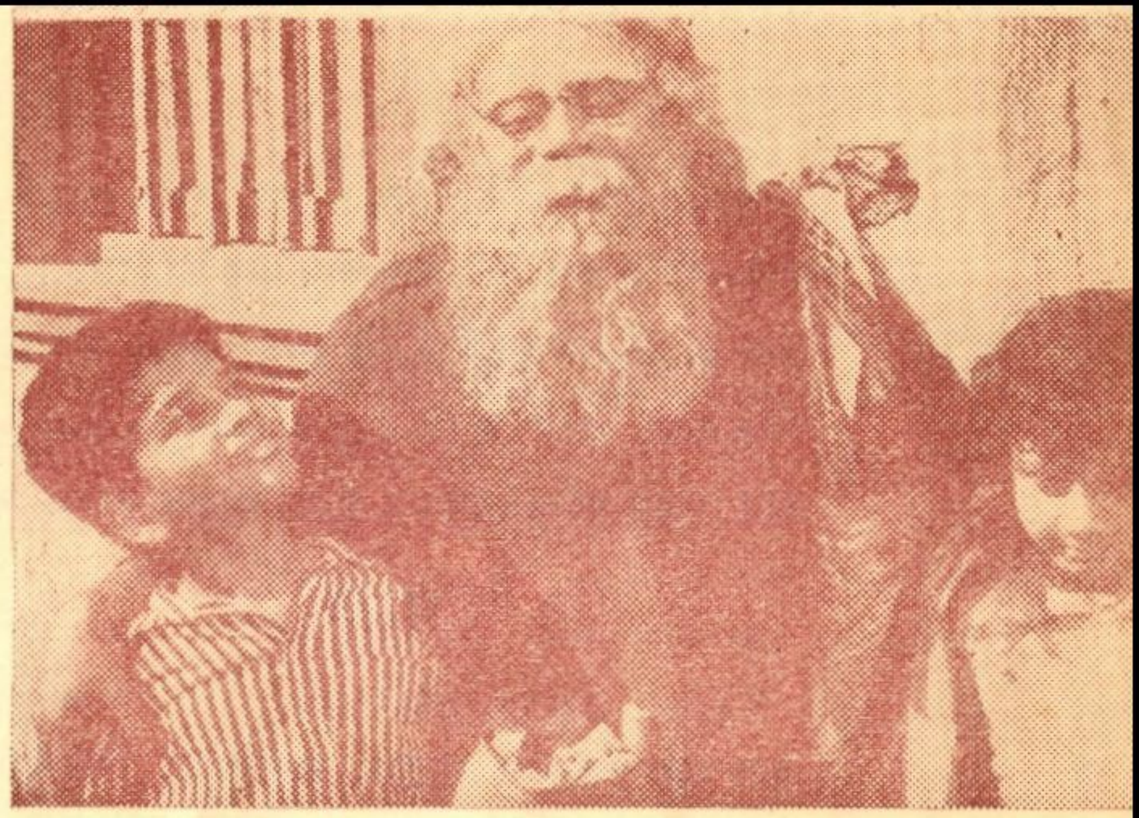

এদিকে কিন্তু কাঞ্চন মিনি ও হরিদাসের সঙ্গে ঝগড়া করে বসেছে। সে যে রোজগার করতে এসেছে এই বিশাল সহরটাতে, সেটা তারা খুব একটা হাসির ব্যাপার মনে করছে। অপমানিত বোধ করে এদেরকে দুয়ো দিয়ে সে এখান থেকেও পালাল। সে ওদের দেখিয়ে দেবে যে সেও পারে রোজগার করে নিজের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করতে।

তাই কাঞ্চন অসুস্থা মাসীর ডাককে উপেক্ষা করে মহানগরের লক্ষ লক্ষ জনতার মধ্যে সে হারিয়ে গেল।

আর রূপকথা নেই, সহরটা এবার নিজের মুখোস খুলে স্বরূপ তুলে ধরল তার কাছে। একটি সমগ্রদিন সে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এখানকার যে চেহারা জানল তা বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই যাতনাদায়ক। এখানে কোন মায়াদয়া নেই। রোজগারের আশায় ঘুরে ভিক্ষে করে, চুরি পর্য্যন্ত করে সে দেখতে পেল,—এখানে কত ধানে কত চাল।

এই চরম ধূর্ত, ভয়াল এবং দয়াহীন সহরের প্রচণ্ড উত্তাপে যখন সে মর মর তখন সে তারই মত দুঃখী এক মুটে মজুরের কাছে দয়া পেয়ে সে এক মুঠো খেয়ে বাঁচল। তখন আর তার মান-অভিমান, লজ্জা অপমান অবশিষ্ট নেই। সেই লোকটিরই কথা মত সে ফিরে গেল মাসীর কাছে।

—জানল মাসী নেই, তিনি শেষ হয়ে গেছেন তার এই নিষ্ঠুর ভাবে চলে যাওয়ার ধাক্কায়। আরও জানল তার মাও মৃত্যু শয্যায়—তিনি বার বার তার নাম ধরে ডাকছেন।

তার সমগ্র প্রাণ বাড়ী যাবার জন্যে কেঁদে উঠলো—

কিন্তু বাড়ী যাবে সে কি করে? সেখানে বাবা যে আছেন! .....

তার পরের ঘটনা দেখবার জন্য কাঞ্চন আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে রূপালী পর্দায়!

গান

(১)

ওরে-ওরে, নরে-হরে, শংকুরে, রামা-শ্যামা, খেঁদি-বুঁচি,
আয় ছুটে আয়—
ওরে-জগা, মাধা-ভজা, কে খাবি আমার ভাজা,
দাঁতে শান্ দিয়ে ছুটে আয়—
কড়র-মড়র! কড়র-মড়র।
কুড়মুড়, কুড়মুড়, কুড়মুড়, ভাজা।
আ—আমার এই হরিদাসের বুলবুল ভাজা।
বুলবুল ভাজা—
কুড়মুড় কুড়মুড় কুড়মুড় ভাজা।
আমার এই হরিদাসের বুলবুল বুলবুল বুলবুল ভাজা।
উল্টে খাও কিম্বা সোজা,
ডাইনে খেলে বাঁয়ে মজা॥
বুলবুল-ভাজা, বুলবুল-ভাজা,
বুলবুল-বুলবুল-বুলবুল ভাজা
শোনরে ভাই মনদিয়া, (হুঁ হুঁ)
একবার রাণী ভিক্টোরিয়ার হুকুমে এই বুলবুল ভাজা
লণ্ডনে যায় (হুঁ হুঁ)॥
তারপরে যা ব্যাপারখানা, ছেড়ে দিয়ে ডিনারখানা
সকাল বিকেল সন্ধ্যে কেবল ভাজা চিবায়, আয়রে—
আয়রে, আয়রে, আয়রে, আয় ছুটে আয়—
রাজা হও কিম্বা প্রজা, না খেলে যায়না বোঝা॥
আমার এই বুলবুল দানা, নিতে কারও নেইকো মানা
সোনাদানার গরবে এ যায়না কেনা
খুকুমণি খোকন সোনা, এ তোদের জন্যে আনা।
তোদের ওই মুখের হাসি ছড়িয়ে দেনা।
আয়রে আয় ছুটে আয়—
আমার এই বুলবুল ভাজা, এ শুধু ছল তোদের খোঁজা
আমার এই হরিদাসের বুলবুল বুলবুল বুলবুল ভাজা॥

(২)

ও-আমি অনেক, ঘুরিয়া, ফিরিয়া, শ্যাষে,
আইলামরে কইলকাত্তা।
এই আজব কইলকাত্তা—
এর রকম সকম দেইখ্যা আমার ঘুইরা গেছে মাথা।
আমি অনেক ঘুরিয়া শ্যাষে আইলামরে কইলকাত্তা।

ওই পদ্মাপারের চরে আমার ছিলরে ঘর বাড়ী,
আর ছিল মা জননী   বিঘা দুই ক্ষেতী বাড়ী।
আমি কি দোষে—
আমি কি দোষে হারাইলাম মাগো
আইলাম সবই ছাড়ি
এখন যেখানে হক্ কথা কই মা পিঠে পড়ে জুত্তা।
হেথা দুইপাশেতে সারি সারি দুকান মণিহারী ॥
আর গাড়ী বাড়ী শাড়ির বাহার হরেক রকমারী ॥
লাখ্ বেলাখের— ওরে লাখ্ বেলাখের কেনা বেচায়
চেঁচায়রে ব্যাপারী
আর নর্দমা খুইট্যা খায় মানুষ কাইন্দা মরে কুত্তা।
এই ইট কাঠে পাথরে গড়া সহর বড় ভারী।
আর ঘড় ঘড়াইয়া টেরাম চলে, চলে হাওয়া গাড়ী ॥
আর ঘেঁষা ঘেঁষি—আর ঘেঁষা ঘেঁষি, ঠ্যাসা ঠ্যাসি,
রইছে নরনারী,
তবু কার কড়ি কে ধারে কেউ না রাখে কারও বার্ত্তা।

হেথা চিমনিতে উড়াইয়া ধূঁয়া ভোঁ বাজাইয়া কলে ॥
ভোর না হইতে ডাকে মানুষ চলে দলে দলে ॥
আর খট্ খটাং খট্—আর খট্ খটাং খট্ খটাস
মেশিন দিবা নিশি চলে।
আর ফুরাইলে কাম ফেইকেক বাহির মাইরা
তারে গোত্তা।
এই আজব কইলকাত্তা, এর হাওড়ার পুল দেইখ্যা
আমার ঘুইরা গেছে মাথা।
এই এত্তাগুলান বরগার সাথে মিলছে এ্যাত্তা কড়ি ॥
এই লক্ষ কোটি মানষেও যদি মিলতো এমন করি ॥
এই জীবনের— ওরে এই জীবনের নদীর উপর সেতু
দিত গড়ি।
পার হইতাম জীবন,   হাইস্যা মরণ,
পাইত নারে পাত্তা।
আমি অনেক ঘুরিয়া শ্যাষে আইলামরে কইলকাত্তা।

(৩)

মাগো আমায় ডেকোনাকো আর।
আমি এখন বাহির হলেম তেপান্তরের পথে,
দুঃখ বেদন জয় ক'রে মা নিতে,
আবার আমি আসবো যখন তোমার কোলে ফিরে,
এই পৃথিবী উজাড় করে দেবো চরন ঘিরে।
যদি গো মন কেমন করে, তারার পানে চেয়ে,
অশ্রু তোমার ঝরে নয়ন বেয়ে,
আমি তোমার ঘুমের মাঝে, স্বপন হ'য়ে এসে,
ভুলিয়ে দিয়ে যাবো মাগো অনেক ভালবেসে।
যদি পাখীর গান শুনে মা হঠাৎ মনে পড়ে,
বাছা তোমার ডাকতো কেমন ক'রে,
কান পেতো মা সন্ধ্যা হ'লে, দখিন বাতায়নে,
বাতাস হয়ে গুণগুণিয়ে যাবো তোমার কানে।
মাগো আমার ডেকোনাকো আর ॥

● ● ●

অভিনয়াংশে যথাক্রমে ঃ পদ্মা দেবী, শৈলেন ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান দীপক, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ট মুখোঃ, গুপী বন্দ্যোঃ, মণি শ্রীমানি, বেচু সিংহ, জলু ঘোষ, শক্তি সেন, শিশির বন্দ্যোঃ, গোপাল চটোঃ, শঙ্কর চটোঃ, জহর রায়, নৃপেন লাহিড়ী, শ্রীমতী কৃষ্ণজয়া, জরাশু চটোঃ, আলো সরকার, পরিতোষ রায়, সুশীল রায়, বারীন বোস, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান স্বপন, মনু মখোঃ, সীতা মুখোঃ, নৃপতি চটোঃ, নীতি পণ্ডিত, মিসেস চার্লিমন, প্রদ্যোৎ মহলানবীশ, শ্রাবন সেন, মহম্মদ ইসরাইল, সতু মজুমদার, মণি গাঙ্গুলী, বিনয় লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য্য, সজল রক্ষিৎ।

নিউথিয়েটার্স ষ্টুডিয়োতে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত, কলিকাতা সহরে এবং সূর্য্যপুরে বহির্দৃশ্য গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে সঙ্গীত গৃহীত ও শব্দপুনর্লিখিত।

একমাত্র পরিবেশক ঃ জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিমিটেড।

সগৌরবে চলিতেছে !

বিমল রায়ের শ্রেষ্ঠ ছবি !!

বিমল রায় প্রোডাকসন্স-এর

সুজাতা

নূতন

সুনীল দত্ত

শশীকলা

সুলোচনা

ললিতা পাওয়ার

কাহিনী
সুবোধ ঘোষ

পরিচালনা
বিমল রায়

সঙ্গীত
এস, ডি, বর্মন

জনতা পরিবেশন

জনতা, দর্পণা, প্রিয়া, কৃষ্ণা, ইণ্টালী এবং সহরতলীর অন্যত্র।

অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মীরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রিত।